চলচ্চিত্র দিবসের ইতিকথা

দেশে প্রতিবছরই পালিত হয়ে আসছে চলচ্চিত্র দিবস। কখনো ছোট পরিসরে কখনো জমকালো আয়োজনে। বড় পরিসরে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা উৎসবে মাতে এই দিনটিকে ঘিরে। কেমন করে এলো এই দিবসটি? **মাসুম আওয়ালের** প্রতিবেদনে চলুন জেনে নেওয়া যাক।

চলচ্চিত্র দিবসের নেপথ্য নায়ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই এই দেশে চলচ্চিত্র যাত্রা করেছিল। তার অনুপ্রেরণাতেই নায়ক ফারুক, সোহেল রানা, অভিনেত্রী অঞ্জনার মতো অনেক চলচ্চিত্রশিল্পী চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতা নামক মহাকাব্যের 'মহাকবি', তিনি বিশ্ব মিডিয়ার দৃষ্টিতে 'পোয়েট অব পলিটিকস'। বঙ্গবন্ধু কবিতা পড়তেন, গান শুনতেন। চলচ্চিত্র নিয়েও তার আগ্রহের কথা জানা যায় তাকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই ও স্মৃতিচারণে।

৩ এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস

বাংলাদেশে ২০১২ সাল থেকে ৩ এপ্রিল দিনটিতে সরকারিভাবে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' পালন করা শুরু হয়েছে। ৩ এপ্রিল যে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস পালন করা হয় সেখানেও জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। ইতিহাস বলে, চলচ্চিত্র নিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেজন্যই ১৯৫৭ সালে তিনি প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে সংসদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি) বিল উত্থাপন করেন এবং এফডিসি বিল পাস হয়। একটি দেশের জন্য তার সংস্কৃতি কত বড় হাতিয়ার, তা অনুধাবন করতেন বঙ্গবন্ধু। এই কারণেই বাংলার সংস্কৃতির জন্য এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল এ বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল সেই কারণেই ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস করার দাবি ওঠে বিনোদন সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্রকর্মীদের পক্ষ থেকে। ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা এবং চলচ্চিত্রকে সরকারিভাবে শিল্প ঘোষণার দাবিতে অনেক সভা, সেমিনার, উৎসব আয়োজন করা হয়। মিডিয়াকর্মী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের দাবিগুলো একসময় গণদাবীতে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস এবং চলচ্চিত্রকে সরকারিভাবে শিল্প ঘোষণা করেন। ২০১২ সালের ২৪ এপ্রিল এক প্রজ্ঞাপনে চলচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণা দেয়া হয়। সেইসঙ্গে দিনটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হিসেবেও পালন করা হয়।

ঢাকার চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি ও চলচ্চিত্র দিবস

বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে প্রতিনিয়তই গবেষণা হচ্ছে। এসব গবেষণা উঠে আসছে চলচ্চিত্রের নানা সংকট ও সম্ভাবনার দিক। 'বাংলাদেশে জাতীয় ও বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস পালনের তাৎপর্য' শিরোনামের এক প্রবন্ধে চলচ্চিত্র গবেষক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, খান আতাউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফরিদপুরের মোহন মিয়া (লাল মিয়া) প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এদেশে চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদে বিল উত্থাপন করে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন' (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। আব্দুল জব্বার খান, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নাজীর আহমদ, আবুল খায়ের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঢকায় ইপিএফডিসি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনসাধারণ, নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের অব্যাহত দাবির মুখে ১৯৫৭ সালে ৩ এপ্রিল সংসদে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল পাস হলে এফডিসিকে কেন্দ্র করে এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সংগঠিত উদ্যোগ শুরু হয়। তার পর থেকে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের এক শক্ত বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। মুখ ও মুখোশ, আসিয়া, আকাশ আর মাটি, জাগো হুয়া সাভেরা, মাটির পাহাড়, এদেশ তোমার আমার, রাজধানীর বুকে, কখনো আসেনি, সূর্যস্নান, কাঁচের দেয়াল, নদী ও নারী এবং আরও পরে সুতরাং, জীবন থেকে নেওয়া ইত্যাদি কাহিনী নির্ভর বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণের মধ্য দিয়ে কিছুটা সংগঠিত হয়ে ওঠে ঢাকার চলচ্চিত্র। ঢাকার চলচ্চিত্রে শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্তের আগমন ঘটে ষাটের দশকের শেষদিকে। যাদের হাতে বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে।

ষাটের দশকে জহির রায়হান, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কবির চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, আলমগীর কবির, কলিম শরাফী, মাহবুব জামিল প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের দেখা যায় সিনেক্লাব, ফিল্ম সোসাইটি ইত্যাদি সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী হিসেবে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে অভিষেক ঘটে যে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন দেশে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতারাই পরবর্তীতে এদেশে বিকাশমান বিকল্প চলচ্চিত্র ধারা গড়ে তোলেন। সামাজিক সম্ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ, প্রগতি, গণমুক্তির বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়ে তারা চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন। বিকল্পধারার চলচ্চিত্র কর্মীদের এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে এদেশে একটি ফিল্ম আর্কাইভ গড়ে উঠেছে। অপর পক্ষে মূলধারা নামে এফডিসি কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র এদেশে কিছু হাতেগোণা ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রমেই হয়েছে দিশাহারা ও লক্ষ্যচ্যুত। ফলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট অভূতপূর্ব শিল্পসম্ভাবনা থেকে দেশের মানুষ বঞ্চিত হলো। গণবিনোদনের অপার সম্ভানাময় এ শিল্পখাতটি আজ তাই মৃত্যুপথযাত্রী।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ই শুরু হয়েছিল এক নতুন ধারার চলচ্চিত্রের পথ চলা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে নির্মিত হয় 'স্টপ জেনোসাইড'। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ও শরণার্থীদের মৃত্যুর প্রতিরোধ স্পৃহার ওপর ভিত্তি করে এ ছবিটি নির্মিত হয়েছে, যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে গড়ে ওঠে বিশ্ব জনমত। স্বাধীনতার পর নির্মিত হয় একগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও আমাদের চলচ্চিত্রে জীবনঘনিষ্ঠ সমাজ বাস্তবতা দেখতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষ ও বিশ্ববাসী। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর একের পর এক এ দেশে নির্মিত হয়েছে মুনাফা অর্জনকারী ফর্মুলাভিত্তিক নকল চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্রে মানুষ সমাজ বাস্তবতার স্পর্শ পায়নি। ষাটের দশকে আমাদের দেশের সোনালি দিনের চলচ্চিত্র যেন নির্বাসিত হয় কালো অন্ধকারে।

অবশ্য আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে একদল তরুণ নির্মাতা সামাজিক বাস্তবতাকে আবারো সেলুলয়েডের ফিতায় তুলে ধরেন। তারা দেশে নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী হন। চলচ্চিত্র সংসদের আন্দোলনের পটভূমিতে এ ধারা দেশে নান্দনিক ধারার অনেক চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যতিক্রমটুকু ছাড়া দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অন্ধকার কাটেনি।'

চলচ্চিত্র দিবসের শপথ

প্রতি বছর শুধু নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র দিবস পালন করলেই চলবে না। দেশের চলচ্চিত্রকে নিয়ে যেতে হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এক সময় সারা বিশ্বেও সকল হলে মুক্তি পাবে বাংলাদেশের সিনেমা। এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। 'বাংলাদেশে জাতীয় ও বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস পালনের তাৎপর্য' শিরোনামের প্রবন্ধে চলচ্চিত্র গবেষক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনে দেওয়া কিছু পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে ঢাকাই সিনেমার স্বার্থেই। একই গদ্যে লেখক আরও বলেন, 'দেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনের অন্ধকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে। আমাদের চলচ্চিত্র যেন দেশের গণমানুষের জীবন, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে সে বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। উন্নত ও আলোকিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তা দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এক সময় প্রত্যেক বাঙালি তরুণের মনে যেমন কবিতা লেখার স্বপ্ন ছিল। তাই আমরা সাহিত্যে এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং সারা বিশ্বে অশ্বেতাঙ্গ হিসেবে প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পেয়েছিলাম। তেমনি এখন বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ-তরুণীর বুকে ঘুমিয়ে আছে স্বপ্নের চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনা। তাদের সে বাসনা পূরণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে সকলে মিলে জাতীয় স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গণে এফডিসিকেন্দ্রিক ও এফডিসিবহির্ভূত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যকার বিভাজন রেখা বিলীন করে দিতে হবে কারণ শেষ বিচারে উন্নতমানের ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণই চূড়ান্ত বিবেচ্য হওয়া উচিত। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিদেশে প্রায় এক কোটি বাঙালি বসবাস করেন। তাদের কথাও মাথায় রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। বিদেশে দেশীয় চলচ্চিত্র উৎসব করার বিষয়ও চিন্তা করা যেতে পারে। শিল্পসম্মত ও প্রতিনিধিত্বমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং রুচিশীল দর্শক সৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রদর্শনীর যাবতীয় সুযোগ সম্বলিত আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইনস্টিটিউট, ফিল্ম আর্কাইভ, ফিল্ম সেন্টার, ফিল্ম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে দেশীয় চলচ্চিত্রে রুগ্‌ণ দশা ঘুচে যাবে। এসব সুবিধা শুধু রাজধানীতে থাকলে চলবে না, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গণমুখী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ভালো ছবির ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা এবং খারাপ ছবির বিপক্ষে সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে গণমাধ্যমকে আরও সোচ্চার হতে হবে। এজন্য সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে তোলা এবং চলচ্চিত্র সাক্ষরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র অধ্যয়নের ব্যাপক সুযোগ তৈরির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সকল সিনেমা হলে পাশাপাশি সনাতন ও ডিজিটাল পদ্ধতির চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি করতে হবে। কারণ প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে নির্মাতারা অনেকেই এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন। এসব চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পুরনো হলগুলোর সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। সিনেমা হলগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত, উন্নত ও নিরাপদ হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি জেলা সদরে নতুন আঙ্গিকে অন্তত পক্ষে একটি আধুনিক ডিজিটাল সিনেমা হল তৈরি করার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।'

সব শেষে এই প্রত্যাশা; এগিয়ে যাক আমাদের প্রাণের বাংলা সিনেমা। জয় হোক বাংলাদেশের সিনেমার।